প্রতিনায়িকা : তব ভুবনে, তব ভবনে

হিল্লোল দত্ত

দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে॥
বাজে ফুলে, বাজে কাঁটায়, আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ওই-যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে॥
তালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই ছন্দে নানান রঙ জাগে

শিশু জন্ম নিল। দেখল আলো। ভয় পেল সে। উঠল কেঁদে। মাতৃগর্ভের অন্ধকার, জল, ভাসমানতা, উষ্ণতা, আশ্রয় ফেলে বেরিয়ে এসেছে সে নতুন আলোয়, বাতাসে, ভারসাম্যহীনতায়, শীতলতায়, অচেনা পৃথিবীতে। তার কিছুই ভালো লাগছে না, কিছুই তার চেনা নয়, কিছুই নয় পছন্দের। কিন্তু, এর সবই কি মন্দ, খারাপ, অমঙ্গলের? তার কাছে যা খারাপ, অমঙ্গলকর, অশুভ, সবই কি তা-ই আসলে?

এই মহাবিশ্বে আমরা একাকী কি না নিঃসংশয়ে জানা যায় নি। বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান বলে না-হওয়াই সম্ভবপর। আমরা বাস করি সূর্য নামের একটি মাঝারি নক্ষত্রের চারপাশে ঘূর্ণায়মান একটি গ্রহে। এর আছে আরো আটটি গ্রহ। তিনটি ছাড়া বাকি সবগুলোরই আছে একাধিক উপগ্রহ। একটি ছায়াপথের অন্তর্গত আমরা, যার মতন ছায়াপথ মহাবিশ্বে অন্তত ১০০ থেকে ২০০ বিলিয়ন থাকার কথা ধারণা হয়; এবং সম্প্রতি জার্মানির এক সুপার কম্পিউটারের হিসেবে এই সংখ্যা ৫০০ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যেতে পারে। প্রতিটি ছায়াপথেই অগণিত বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র, যার বেশিরভাগেরই একেকটি সৌরজগৎ থাকার কথা।

এই সুমহান, সুবিস্তৃত, সুদীর্ঘায়িত, ক্রমাপসারী ও ক্রমবর্ধমান মহাজগতে ঠিক কোনো সুনির্দিষ্ট মঙ্গলামঙ্গলের নিয়ম আছে, সেটা ভাবাটাই তো একটা হাস্যকর, অর্থহীন, নিষ্ফল অবধারণ হতে বাধ্য!

বেশ, মহাবৈশ্বিক মহাহিসেব বাদ দিলাম। স্রেফ মানব সম্প্রদায়ের গত কয়েকশ বছরের ইতিহাসে আসি।

'দ্য স্টোরি অব সিভিলাইজেশন' (১৯৩৫-১৯৬৫) নামের মহাগ্রন্থের রচয়িতা উইলিয়াম জেমস 'উইল' ডুরান্ট (৫ নভেম্বর ১৮৮৫ - ৭ নভেম্বর ১৯৮১) ও তাঁর পত্নী এরিয়েল ডুরান্ট (২০ মে ১৮৯৮ - ২৫ অক্টোবর ১৯৮১) এগারো খণ্ডের ওই বৃহদাকৃতির ১০ হাজার পৃষ্ঠার বইটি পরবর্তীকালে ঝাড়পোঁচ করে আধুনিক করতে গিয়ে একটি সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ লেখেন 'দ্য লেসনজ অব হিস্ট্রি' (১৯৬৮) নামে। সেখানে তাঁরা তেরোটি অধ্যায়ে ইতিহাসের নানান দিক তুলে ধরেন; যেমন, ইতিহাস ও পৃথিবী, জীববিদ্যা ও ইতিহাস, জাতি ও ইতিহাস, চরিত্র ও ইতিহাস এরকম। তার মধ্যে একটি, ধর্ম ও ইতিহাস অধ্যায়ে ইতিহাসে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও কার্যকরতা নিয়ে নানান কথা বলার পরেও তাঁরা নির্মোহভাবে জানান : 'ইতিহাস কি ঈশ্বরের ধারণা সমর্থন করে? ঈশ্বর বলতে যদি আমরা প্রকৃতির সৃজনশীল প্রাণশক্তি না-বুঝিয়ে বুদ্ধিমান ও সহৃদয় কোনো মহাসত্তার কথা বুঝে থাকি, তবে উত্তরটা হবে এক অনাগ্রহী না। জীববিদ্যার অন্য শাখার মতোই, গোড়ার দিকে ইতিহাস এমন এক সংগ্রামে সর্বোত্তম একক প্রাণের ও দলের প্রাকৃতিক নির্বাচন যেখানে ভালোমানুষি কোনো সুবিধেই পায় না, দুর্ভাগ্য অজস্র, আর শেষ

পরীক্ষাটাই হচ্ছে টিকে-থাকার যোগ্যতা। এর সাথে যোগ করুন মানুষের অপরাধ, যুদ্ধ আর নৃশংসতা, ভূমিকম্প, ঝড়ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণিবাত্যা, পতঙ্গহামলা, উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস এবং অন্যান্য যত 'ঐশ্বরিক কর্ম', যেগুলো সময়ে সময়ে মানুষ ও প্রাণীদের জীবন দুর্বহ করে ছাড়ে, তাহলে মোটের ওপর প্রমাণাদি অন্ধ অথবা নিরপেক্ষ ক্ষয়ক্ষতির দিকেই আঙুল তুলে। মাঝেসাঝে দেখা মেলে আকস্মিক বা আচমকা এলোমেলো কিছু দৃশ্যের, যাদের আমরা ব্যক্তিগত বিচারে নাম দেই নিয়ম, মহানুভবতা, সৌন্দর্য বা মহত্ত্ব। ইতিহাস যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব সমর্থন করেই থাকে তবে সেটা হবে দ্বৈতবাদ; যেমন, জরথ্রুস্টবাদ বা মানিকীয়বাদ : মহাবিশ্ব ও মানবাত্মার দখল নেওয়ার জন্যে যুযুধ্যমান একটা শুভ আত্মা আর একটা অশুভ আত্মা। এসব বিশ্বাস আর খ্রিষ্টীয়ত্ব (যেটা মূলত মানিকীয়বাদ) তাদের অনুসারীদের নিশ্চিত করেছে যে অন্তিমে জেতে শুভ আত্মাই; কিন্তু এই চূড়ান্ত মতে ইতিহাস কোনো নিশ্চয়তা দেয় না। প্রকৃতি এবং ইতিহাস আমাদের ভালো বা মন্দের ধারণার কোনো ধারই ধারে না। ভালো তাদের কাছে সেটাই যেটা টিকে গেছে, আর খারাপ হলো যেটার পতন হয়েছে। আর যিশুর প্রতি যেমন মহাবিশ্বের কোনো পক্ষপাত নেই, তেমনি নেই চেঙ্গিস খানের বিরুদ্ধেও।'

মোদ্দা কথা, ভালো বা মন্দ, মঙ্গল বা অমঙ্গল, সৎ বা অসৎ-এর ধারণা নিতান্তই আপেক্ষিক, তুচ্ছ ও আপাতসম্ভব। তবে কি খারাপ বলে কিছু নেই কিংবা মন্দ বলে, ক্ষতিকর বলে, বর্জনীয় বলে, ভয়ঙ্কর বলে? প্রতিরোধ করতে হবে না যা অন্যায়, রুখে দাঁড়াতে হবে না যা অবিচার, উপড়ে ফেলতে হবে না যা অমানবিক, তাড়িয়ে দিতে হবে না যা অসুন্দর, বন্ধ ও বিচার করতে হবে না যা অপরাধ?

যুগ যুগ ধরে এই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গলামঙ্গলের দ্বান্দ্বিকতায় দীর্ণ হয়েছে মানবসম্প্রদায় ও সভ্যতা। ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, বিচার, সমাজ সবকিছুই এই দুইয়ের লড়াইয়ে পক্ষ-বিপক্ষ সন্ধান করেছে। নিজের বিপক্ষের বিরুদ্ধে অজস্র আইন, নীতি, শাস্তি, ধিক্কার, বর্জন চাপিয়েছে। প্রতিপক্ষের সাথে লড়াইয়ের নাম দিয়েছে ধর্মযুদ্ধ, জিহাদ, ক্রুসেড। আর শেষমেষ থিসিস আর এন্টিথিসিসের সংমিশ্রণে সিন্থেসিস কিংবা হয়ত বিপক্ষকে আংশিক বা পুরোই ধ্বংস করে নিজের জয়পতাকা উড়িয়ে বিজীগিষায় আপ্লুত হয়েছে।

কিছু তারপরও ভালো হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে বা থেকেছে, যদিও সময়ের সাথে এসবের ধারণাও পালটেছে। নরহত্যা, শিশুহত্যা, নারীধর্ষণ, শোষণ, দুর্বলের ওপর আক্রমণ, অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা, অন্যদের সুযোগ দেওয়া, পরনিন্দা, চক্রান্ত মোটের ওপর এসব খারাপ হিসেবেই স্বীকৃত। আবারো বলি, অনেকসময় এসবও পালটে গেছে সময়ে সুযোগে। আক্রমণকারীদের হত্যা স্বীকৃত, প্রতারকদের সাথে প্রতারণা করা খুব খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয় না। রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তার স্বার্থেই স্বদেশে বা বিদেশে নজরদারি করে, ষড়যন্ত্র করে অন্যের ষড়যন্ত্র ধরতে বা বিফল করতে।

তাহলে অমঙ্গল, অশুভ, মন্দ কিছু আছে? আপাতদৃষ্টিতে ধরে নেই যে আপেক্ষিক হলেও কিছু আছে। নইলে আর আইন, নৈতিকতা, সামাজিক নিন্দেমন্দের কাজ কি ছিল, তা সে যতই পরিবর্তনশীল হোক না কেন!

অবশ্য, আবারো বলি, সবই বদলায়।

শান্তারাম উপন্যাসে গ্রেগরি উইলিয়াম রবার্টসন বোম্বে শহরের নামকরা এক গডফাদার আবদুল কাদের খানের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন,

'এই মহাবিশ্ব, এই মহাবিশ্ব যেটা আমরা জানি, আরম্ভ হয়েছিল পুরোপুরি সরলতা দিয়ে। আর এটা পনেরো বিলিয়ন বছর ধরে আরো আরো জটিল হয়েছে। আরো এক বিলিয়ন বছরে এটা এখনকার চাইতে আরো জটিল হবে। আরো পাঁচ বছর, দশ বছরে এটা বরাবরই জটিলতর হতেই থাকবে। এটা যাচ্ছে কিছু একটার দিকে। এটা ছুটছে কোনো এক ধরনের চূড়ান্ত জটিলতার দিকে। সেখানটায় পৌঁছুতে পারব না আমরা। হাইড্রোজেনের একটা অণু পৌঁছুতে পারবে না সেখানে, কিংবা একটা পাতা বা একটা মানুষ, অথবা হয়ত একটা গ্রহ যেতে পারবে না সেখানটায়, সেই চূড়ান্ত জটিলতার দিকে। কিন্তু সবাই আমরা যাচ্ছি সেদিকেই— মহাবিশ্বের প্রতিটা বিন্দুই যাচ্ছে সেদিকে। আর সেই চূড়ান্ত জটিলতা, যেটার দিকে আমরা ধেয়ে যাচ্ছি সবাই, সেটাকেই আমি বলি ঈশ্বর। যদি শব্দটা তোমার পছন্দ না হয়, ঈশ্বর, বলো এটাকে চূড়ান্ত জটিলতা। যা কিছুই তুমি একে বল না কেন, সমগ্র মহাবিশ্বই এর দিকে ধাবিত। যা কিছুই চূড়ান্ত জটিলতার দিকে ওই যাত্রাটা বাড়ায়, তুলে ধরে, এর গতিবৃদ্ধি ঘটায়, তা-ই ভালো। যা কিছুই চূড়ান্ত জটিলতার দিকে এই যাত্রাটায় বাধা দেয়, গতি কমায় বা থমকে দেয়, তা-ই খারাপ। ভালো আর খারাপের এই সংজ্ঞার্থের সবচে চমৎকার দিক হচ্ছে এটা নৈর্ব্যক্তিক আর বৈশ্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য, দুইই।'

সবাই একমত হবেন না, তবে, সবকিছুতে কজনই বা একমত হতে পারে? সৌন্দর্য তো বৈচিত্র্যই।

এই ভালো-মন্দের দ্বান্দ্বিকতার সাথে প্রতিতুলনায় কারোর মনে হয়ত উঁকি দিয়ে যেতে পারে আরো একটা এরকম দ্বান্দ্বিক, অচ্ছেদ্য ও 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত' সম্পর্ক। নারী ও পুরুষের।

যৌনচিহ্নবাহী মানবপ্রজাতির দুটি ভিন্নতর এবং সমিল সদস্যের ভেতর পার্থক্য কতটা আর সাদৃশ্য কতটুকু, সেই নিয়ে গবেষণা আজো প্রবহমান। তবে, পুরুষতন্ত্র নামের আদিম ব্যাধির কারণে নারী অনেক ক্ষেত্রে, এই একবিংশ শতাব্দীতেও, নানান মন্দ, খারাপ, দুর্বলতা, অমঙ্গল ও অশুভ সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক; এবং কখনো কখনো খোদ নারীই তার ওপর চাপিয়ে-দেওয়া এই কলঙ্করেখা বহন করে স্বেচ্ছায়। কখনো নিজেকেই করে দায়ী, কখনো অন্য নারীদেরও। বেগম রোকেয়া পরিবারের বেলায় স্বামী ও স্ত্রীকে দুটি চাকার সাথে তুলনা করে দেখিয়েছিলেন, দুটো দুই কিসিমের হলে পরিবার ঠিকভাবে চলে না। একইরকম তুলনা সমাজের বেলাতেও দেওয়া চলে। স্রেফ অর্ধেকটা অঙ্গ অকেজো বা দুর্বল থাকলেই যদি শরীরের কাজের ক্ষমতা ও সামগ্রিকভাবে উন্নতির সুযোগ অনেকাংশে কমে যায়, তবে সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেটার পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বেশিই।

তবে, যেহেতু রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, পরিবার, আইন, এমনকি চলতি রসিকতার বেলাতেও নারীরা পিছিয়ে-পড়া, অমঙ্গলজনক, ভোগ্য, দুর্বলতর, ভেদ্য হিসেবে স্বীকৃত, তাই এসব নিয়ে কে আর ঘামায় মাথা। সবাই ধরেই নিয়েছে যে, নারীরা তো এমনই হয়, সেই শেক্সপিয়রের, 'Frailty, Thy Name is Woman' থেকে নারীদের সমান সম্পত্তির দাবির বিপরীতে ঢাকার রাস্তায় মৌলবাদীদের মিছিল থেকে শুরু করে সবখানেই এই সুরই প্রতিধ্বনিত।

বলা হচ্ছে মহাভারতে, 'তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি; এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করলে স্ত্রীজাতি কখনোই ভয়ানকত্বে ওগুলোর থেকে ন্যূন হবে না। বিধাতা যখন সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়ে মহাভূত সমুদয় ও স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করেন, সে-সময়েই স্ত্রীদের দোষের সৃষ্টি করেছেন।' আরেক জায়গায় বলা হচ্ছে, 'ইহলোকে স্ত্রীলোকের থেকে পাপশীল পদার্থ আর

কিছু নেই। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এর সবগুলোর সাথে তাদের তুলনা করা যায়।'

আদিপুস্তকে আদমের সঙ্গিনী হাওয়ার ওপর সদাপ্রভুর অভিশাপ সেই আদ্যিকাল থেকেই, 'আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব; তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার ওপর কর্তৃত্ব করিবে।" অর্থাৎ, শুধু পুরুষতন্ত্রের সেবাদাসীই সে নয়, বরং সেই সেবার ফলাফলও সে ভোগ করবে অসহ বেদনায়, শরীর ও মনের।

আল-কোরানে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষিত, 'পুরুষ নারীর কর্তা— আর সেটা এ কারণে যে পুরুষ ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে' (৪:৩৪); 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার' (২:২২৩); 'স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে ভালো করে উপদেশ দাও, তারপর তাদের বিছানায় যেও না ও তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ খুঁজবে না' (৪:৪)। তা ছাড়া, হাদিসের নানা স্থান পরিপূর্ণ নারীদ্বেষী ও পুংশ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায়, 'আমি যদি অন্য কাউকে সিজদা করতে আদেশ করতাম, তবে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে'; 'আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়তে-থাকা বেশিরভাগ নারীদেরই দেখেছি। কারণ, তোমরা নিয়ত অভিশাপ দাও আর তোমাদের স্বামীদের সাথে অবিশ্বস্ত। বুদ্ধিতে ও ইমানে তোমাদের চাইতে কমজোর আমি আর কাউকে দেখি নি। তোমাদের কারোর কারোর কারণে একজন সতর্ক বিবেচক মানুষ উচ্ছন্নে যেতে পারে।' (সহিহ বুখারি : ১:৬:৩০১)। 'গাধা, কুকুর ও নারী যদি সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, তবে নামাজ কায়েম হবে না' (সহিহ বুখারি : ১:৯:৪৯০)। 'নারী বেড়ে ওঠে আর তার অবসান ঘটে শয়তানের রূপে' (সহিহ মুসলিম : ৮:১০৩৮)। 'আমার চলে-যাওয়ার পরে আমি নারীর চাইতে ক্ষতিকর আর কিছু রেখে যাচ্ছি না (সহিহ বুখারি : ৭:৬২:৩৩)।

পাইলে নিভৃত স্থান, পাইলে অবসর
হেন নারী নাই এই পৃথিবীর ভিতর।
না করিবে পাপ যেই, না পেলে অপরে
পঙ্গুর সহিত রত হয় ব্যভিচারে।
সত্য বটে ভাবে লোকে সুখদা রমণী
কিন্তু সর্ব নারী হয় পরপুরুষগামিনী।
দমিতে নারীর মন নিগ্রহের বলে
শক্তি কাহারো নাই এ মহীমণ্ডলে।
প্রিয়ঙ্করী, তবু এরা বিশ্বাস অযোগ্যা,
বেশ্যা, তীর্থবৎ এরা সর্বজনভোগ্যা।

এহেন বিশ্লেষণী মন্তব্য বৌদ্ধশাস্ত্র সুত্ত পাটকের খুদ্দক নিকায়ের কুণাল জাতকের কুণালের। তিনি আরো বলেন :

নারীর চরিত্র আমি বলিতেছি আজ
সাবধানে শ্রবণ করো হে গ্রিথরাজ
সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, নরপতি আর নারী
পুরিতে কাহারো সাধ্য নাই এই চারি।
এক রমণীর যদি হয় অষ্টপতি

বীর বলবান সবে, কামপ্রদ অতি
লবিতে নবম তবু চায় সেই মনে
আগ্নেয়গিরি অপূর্ণ তার থাকে সর্বক্ষণে।
অগ্নিসম সর্বভক্ষা সকল রমণী
নদীসমা সর্বনারী সর্বপ্রবাহিণী
কণ্টকশাখার তুল্য রমণী সকল
পুরুষের হয় হেতু দুঃখের কেবল।
ধনলোভে সব নারী কুপথেতে যায়
ত্যাজি পতি রত হয় পরপুরুষ সেবায়
নারীর গমন সদা অধঃপথে
মরণের পর নরকে নিবাস
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে
দূর হতে ত্যাজি নারীদের পাশ।
ডুবিলে নারীর মায়ার আবর্তে
ব্রহ্মচর্য পায় অচিরে বিনাশ
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে
দূর হতে ত্যাজি রমণীর পাশ।

কুণাল জাতকে আরো বলা হয়েছে,

চৌর, বিষদিগ্ধ সুরা, বিকথি বণিক
কুটিল হরিণ শৃঙ্গ, দ্বিজিহ্বা সর্পিণী
প্রভেদ এদের সঙ্গে নেই রমণীর।
প্রতিচ্ছন্ন মলকূপ, দুষ্কর পাতাল
দুস্তোস্যা রাক্ষসী, যম সর্বসংহারক
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।
অগ্নি, নদী বায়ু, মেরু (পাত্রাপাত্রভেদ
জানে না যে) কিংবা বিষবৃক্ষ নিত্যফল
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।

খোদ গৌতমের মতে, 'নারী যেহেতু গৃহের মোহ তৈরি করে তাই নারী অবশ্যই পরিত্যাজ্য।' নৈতিকতার উৎস হিসেবে দাবিদার ধর্ম, মহত্ত্বগৌরবের সংকলক হিসেবে দাবিদার ধর্ম, ঐশ্বরিক বাণী ও প্রেরিত পুরুষের (নারী নেই, পয়েন্ট টু বি নোটেড) জাতগৃহ হিসেবে দাবিদার ধর্ম, সমগ্র মানবজাতির ভূতভবিষ্যতের কল্যাণকামী হিসেবে দাবিদার ধর্মেরই যদি এই দশা হয়, তবে কা পরে অন্যে কথা!

ধর্মশাস্ত্র থেকে নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য থেকে লোকসাহিত্য, বাস্তবতা থেকে কল্পলোক, সবখানেই পুরুষের হাতে, মননে, ও সৃজনে নারী 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।' তবে নারীনিন্দায় নিয়ত আলীঢ় পুরুষরসনা, ললনা লালসায়ও। এই এক অদ্ভুত লাভ-হেইট রিলেইশনশিপ! কারণ, 'পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা।'

তীব্র বাক্যে এই পুরুষতান্ত্রিকতার দিকে তীক্ষ্ণ ভল্ল ছুড়েছেন হুমায়ুন আজাদ (২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ - ১১ আগস্ট, ২০০৪) : 'পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য কুৎসিত অভিধায়; তাকে বন্দী করার জন্যে তৈরি

করেছে পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্র; উদ্ভাবন করেছে ঈশ্বর, নিয়ে এসেছে প্রেরিতপুরুষ; লিখেছে ধর্মগ্রন্থ, অজস্র দর্শন, কাব্য, মহাকাব্য; সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও আরো অসংখ্য শাস্ত্র। এতো অস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয় নি কোনো সেনাবাহিনী। এর কারণ পুরুষের যৌথচেতনায় মহাজাগতিক ভীতির মতো বিরাজ করে নারী। তাই নারীর কোনো স্বাধীনতা স্বীকার করে নি পুরুষ। পুরুষ এমন এক সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছে, যা নারীকে সম্পূর্ণ বন্দী করতে না পারলে সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে পুরুষের ভয় রয়েছে। এর নাম পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার প্রথম শোষকশ্রেণী পুরুষ, প্রথম শোষিতশ্রেণী নারী। এ-সভ্যতার সব কেন্দ্রেই রয়েছে পুরুষ। পুরুষ একে সৃষ্টি করেছে তার স্বার্থ ও স্বপ্ন অনুসারে এবং কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেকে। পুরুষতন্ত্রের সৌরলোকের সূর্য পুরুষ; নারী অন্ধকার। পুরুষ সবকিছু তৈরি করেছে নিজের কাঠামোতে; তার বিধাতা পুরুষ, প্রেরিতপুরুষ পুরুষ, প্রথম সৃষ্টি পুরুষ; নারী ওই পুরুষের সংখ্যাতিরিক্ত অস্থিতে তৈরি পুতুল। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় পুরুষ মুখ্য, নারী গৌণ; পুরুষ শরীর, নারী ছায়া; পুরুষ প্রভু, নারী দাসী; পুরুষ ব্রাহ্মণ, নারী শূদ্রী। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা পুরুষের জয়গানে ও নারীর নিন্দায় মুখরিত। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় শয়তানের চেয়েও বেশি নিন্দিত নারী; শয়তান পুরুষ ব'লে তার জন্যেও গোপন দরদ রয়েছে পুরুষের, কিন্তু কোনো মায়া নেই নারীর জন্যে।' (নারী : ১৯৯২)।

এককথায় জানিয়েছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ - ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮) তাঁর 'নারীর মূল্য' (১৯২৪) গ্রন্থে : 'নারীত্বের মূল্য কি? অর্থাৎ, কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ, তাঁহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী! অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন।

দাম কষিবার এ ছাড়া যে আর কোন পথ নাই, সে কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।'

এই পুরুষতান্ত্রিক সহস্র বর্ষের অন্ধকারের বিপরীতে চমকজাগানো কর্কশোক্তি করেছিলেন তসলিমা নাসরিন তাঁর 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য' (১৯৯২) প্রবন্ধ সংকলনের ভূমিকায় : "নিজেকে এই সমাজের চোখে 'নষ্ট' বলতে আমি ভালবাসি। কারণ একথা সত্য যে, যদি কোনও নারী নিজের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করতে চায়, যদি কোনও নারী কোনও ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের নোংরা নিয়মের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ায়, তাকে অবদমনের সকল পদ্ধতির প্রতিবাদ করে, যদি কোনও নারী নিজের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় তবে তাকে 'নষ্ট' বলে সমাজের ভদ্রলোকেরা। নারীর শুদ্ধ হবার প্রথম শর্ত 'নষ্ট হওয়া'। 'নষ্ট' না হলে এই সমাজের নাগপাশ থেকে কোনও নারীর মুক্তি নেই। সেই নারী সত্যিকার সুস্থ ও শুদ্ধ মানুষ, লোকে যাকে 'নষ্ট' বলে।"

কিছু এমন নষ্ট নারীর সাথে পরিচিত হওয়ার মানসে আজ আমাদের এই পাঠযাত্রা। বৃহত্তর ভূমিকায় অতিষ্ঠ পাঠকের হতাশা আরো একটু বাড়ানো যায় এই ভাবনে যে শুরুতে বলা ভালোমন্দের দ্বিবিভাজনের মতন এসব পরিচিতিতেও সুস্পষ্ট লক্ষ্মণরেখা টানা মুশকিল, ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব। কখনো তারা পুরুষতন্ত্রের পরিচয়রেখায় ডাকিনী, পিশাচী, রাক্ষসী, আবারো কখনো তারা লিঙ্গনির্বিশেষেই খারাপ বা মন্দ বা অশুভ বা অমঙ্গলকারক বা আতঙ্কজনক।

পাঠকেরই বিচারের ক্ষমতা অবারিত, তাঁরাই পাঠান্তে জেনে বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন। লেখক পূর্ববারতাবাহক মাত্র। পুরাণ থেকে, ইতিহাস ঘেঁটে, সাহিত্য, চলচ্চিত্র তথা শিল্পরাজ্য সেঁচে এহেন Femme fatale-এর বিবরণীপাঠে আপনাকে, হে তন্নিষ্ঠ পাঠক, স্বাগত।

প্রথমত ফিরে যাই মেসোপটেমিয়ার সেই ধর্ম ও কিংবদন্তিকথায়, অন্তত খ্রিষ্টজন্মের ২০০০ বছর আগে, ব্যাবিলনের আদিপুস্তক বা সৃজনমহাকাব্যে, নাম যার এনুমা এলিশ।

শুরুতে, অন্য অনেক জেনেসিসের মতন, জল থেকে বা প্রাগ্‌পার্থিব বিশৃঙ্খলা থেকে জন্ম নিলেন দুই আদিতম যমজ দেবদেবী, অপ্সু ও তিয়ামত। অপ্সু মিষ্টি জলের দেবতা ও তিয়ামত লবণাক্ত জলের রানি। বাকি সব দেবদেবী জন্মালেন তাঁদেরই গর্ভে ও ঔরসে। অপ্ থেকে জন্ম বলে ভারতীয় একশ্রেণির দিব্যাঙ্গনাদের নাম ছিল অপ্সরা, মিলে যায় যেন অপ্সুর সাথে, ভারতীয়-ইউরোপী ভাষাগোষ্ঠীর দৃশ্যমান চিহ্ন সম্ভবত।

অপ্সু ভারি তিক্তবিরক্ত, ক্ষুব্ধ, আক্রোশপরায়ণ তরুণ দেবকুলের ওপর। তারা ভারি হৈহল্লা করে, ঘুমুনো যায় না, শান্তি পাওয়া যায় না জেগে থাকলে, মান্যিগণ্যি করে না। বিশৃঙ্খলা ও উতরোল দশাজাত অপ্সু মোটেও সুসভ্য দেবতা নন। ওল্ড টেস্টামেন্টের ক্রুদ্ধ জিহোভার মতন নিজের সন্তানদেরই বিনাশ চান তিনি। জেনারেশন গ্যাপের ইতিহাস সহস্রবর্ষ প্রাচীন। পক্ষান্তরে, আদিমাতা, জগজ্জননী, দেবমাতা তিয়ামত রাজি নন এতে। গর্ভজাত সন্তানদের তিনি সাদরে পরিপালন করাতেই উৎসুক। তাঁর নামের পেছনেও আছে তামতু, সাগরের আক্কাদীয় প্রতিশব্দ, প্রাচীন তি'আমতাম থেকে যা আগত। দুরকমের জলের মিশ্রণেই নবজাতকদের উদ্ভব। হ্যারিয়েট ক্রফোর্ডের ভাষ্যে মধ্য পারসিক উপসাগরে এই দ্বিবিধ জলের মিলন স্বাভাবিক সংঘটন হিসেবে দেখেন। প্রাচীন সুমের সভ্যতার উদ্ভব সেখানেই যার নাম বাহরাইন, যার অর্থ দুই সাগর, আর যেখানে অবস্থিত দিলমুন, যেখানে সুমের সভ্যতার আঁতুরঘর। তিয়ামতও তাই, তিনি উম্মু-হুবুর, সবকিছুরই ধাত্রী ও জন্মদাত্রী। সৃষ্টিপূর্ব নৈরাজ্য তিনি ও অপ্সু মিলে পূর্ণ করেন প্রথম বারিতে।

কিন্তু অপ্সু তাঁর মন্ত্রী মুম্মুর সাথে মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে এসব উদ্ধত, কলরোলসৃজক, অবাধ্য জাতকদের হত্যা করতেই হবে। সন্তানহনন ডকিন্সের সেলফিশ জিনতত্ত্ব পুরোপুরি সমর্থন না-করলেও জীবজগতে অস্তিমান প্রপঞ্চ, বিরলতর হলেও। এমনকি, মাতৃপিতৃহত্যাও। তরুণ দেবতারা এর খবর পেয়ে গেলেন। এনকি, জাদুবিদ্যা ও গভীরের সুমিষ্ট জলের দেবতা এবং সব শিল্পসাহিত্য ও কারিগরির পৃষ্ঠপোষক, ঘুম পাড়িয়ে দিলেন তাঁদের; এবং বধ করলেন দুজনকেই।

কোথাও আছে, তিনি তাঁর নিজের মন্দির এ-আবজু-এর নিচে পুঁতে রাখলেন তাদের। এরিজুর জলাভূমিতে সেই মন্দিরে তিনি পত্নী দমকিনার সাথে শোকে, বেদনায়, অপরাধবোধে নির্বাসন নিলেন। জন্ম হলো সেখানে দেবপুত্র মোরদোখের, বিস্ময়বালক, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ও অনন্য, ভূমির সব দেবদেবীর আশীর্বাদান্বিত, দেবসেনাপতি কার্তিক যেন সে।

তার জন্ম প্রয়োজন ছিল, কারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন প্রাচীনতমা উন্মাতাল সময়ের জননীতমা তিয়ামত, যিনি সন্তানদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তিনিই এখন সঙ্গীহারার বেদনা ও ক্ষোভে ক্ষিপ্ত, দীপ্ত, প্রতিহিংসালোলুপ। রিভকা হ্যারিস তাঁর জেন্ডার অ্যান্ড এইজিং ইন মেসোপটেমিয়া : দ্যা গিলগামেশ এপিক অ্যান্ড আদার এনসিয়েন্ট লিটারেচার (১৯৯৯) গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে জানাচ্ছেন, সৃজন মহাকাব্যে তিয়ামতকে সর্বপ্রথম দেখি আমরা প্রথম জননী হিসেবে, সন্তানধারণকালে। ক্ষমাধাত্রী তিনি, অজস্রদাত্রী,

সন্তানবাৎসল্যে তিনি অপ্সুর বিরোধিতা করেন হত্যাচিন্তনের। তাঁর আরেক নাম ছিল এল্লেতু কিংবা পরিশুদ্ধ। কিন্তু পরিবর্তিত হয়েছেন তিনি বয়েসের হাতে ও ভারে, আরো স্বাধীন তিনি, আরো দৃঢ়প্রত্যয়ী, সঙ্গীরিক্ততায় প্রবলভাবে আলোড়িত, স্নেহপ্রবণ মাতা থেকে তিনি এখন জিঘাংসু পত্নী।

এবার জন্ম দিচ্ছেন তিনি অগণিত বীভৎস, হিংস্র, আক্রমণাত্মক সরীসৃপের। প্রতিশোধ চাই তাঁর। তিনি জন্ম দিলেন বাসমু (বিষাক্ত সাপ), উসুমগাল্লু (মহাড্রাগন), মুসশুস্সু (ক্ষিপ্ত সাপ), উরিদিম্মু (উন্মত্ত সিংহ), গিরতাবলুল্লু (কাঁকড়াবিছে-মানব) এমনকি এগারো প্রজাতির দানবের। রণসাজে সজ্জিত হলেন তিনি, সেনাপতি মনোনীত করলেন তাঁরই গর্ভজাত পুত্র কিংগু-কে, যে তার বর্তমান প্রেমিক ও স্বামীও বটে। এই পদে তিয়ামতই অধিষ্ঠিত করেছেন তাঁকে। কিংগুকে চুম্বন করে রণসাজে সাজিয়ে তার হাতে তুলে দিলেন নিয়তির প্রস্তরফলক ও সেনাদলের নেতৃত্ব। স্পষ্টতই, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের, মাতার ক্ষমতার, মাতার প্রাধান্যের প্রমাণ এবং অজাচারেরও।

ওদিকে, দেবকুলেও সাজসাজ রব। মোরদখ সেজেছেন বায়ুশর, জাল, গদা, আর অজেয় এক বল্লম নিয়ে। দেবতারাই তাঁকে দিয়েছেন সেসব এবং এক উজ্জ্বল বর্ম, দেবী দুর্গার রণসাজের সাথে মিল দৃশ্যমান বৈকি। বায়ুদের সঙ্গী করে এবং তাঁর সেনাদলের, মোরদখ চলেছেন মাতৃহননের নান্দীপাঠ সাঙ্গ করে। পরশুরামের মতন তিনিও শাণ দিয়েছেন তাঁর মারণাস্ত্রে। তবে, এখানে নারীটি নিরীহ, অনুগত, গৃহস্থ, প্রেমময়, ব্রাহ্মণকন্যা নন।

প্রথম দিকে কিংগুর করাল অনীকিনী দেখে, তিয়ামতের গর্জন শুনে ও তাদের ক্ষমতার কথা বহুবর্ষ ধরে জেনে কিছুটা ভয়ার্ত থাকলেও মোরদখ লড়াইতে ফিরে আসেন সাহস ও রণহুঙ্কার দিয়ে। তিয়ামতের তাকে জাদুমন্ত্র দিয়ে আটকানোর প্রচেষ্টা বিফল হয়। তিয়ামত ধারণ করেছেন অপারবিস্তারী ড্রাগনের রূপ, আব্যোমভূমিবিস্তৃত হাঁ করে তিনি গিলে ফেলতে চান মোরদখকে, তাঁরই পৌত্রকে। পিতামহী তিয়ামতকে আটকে ফেলেন মোরদখ তাঁর চটুল, কার্যকর ও শক্তিশালী জালে। যতই ছাড়াতে চান, ততই আটকে যান তিয়ামত। এবার পিশুন হাওয়াকে পাঠান মোরদখ, সে তিয়ামতের হাঁয়ের ভেতর ঢুকে তার বিপুল দেহটি আরো ফাঁপিয়ে তুলে। ড্রাগনের মুখ আর বন্ধ হয় না। মোরদখ বল্লমাঘাতে প্রাণবায়ুই বের করে দেন তিয়ামতের তার বিপুল বপুটি ফাঁসিয়ে। তিয়ামতের পেছনের দিকটায় দাঁড়িয়ে নির্মম মুগুরাঘাতে তিনি গুঁড়িয়ে দিতে থাকেন তাঁরই পিতামহীর সতেজ মস্তিষ্কময় খুলি। তাঁর শিরা-ধমনী কেটে উন্মুক্ত করা হয়। উত্তুরে হাওয়া সেসব নিয়ে যায় কোনো অজানা গন্তব্যে।

দ্বিখণ্ডিত করেন তিনি তিয়ামতের দেহ। তাঁর উত্তরার্ধ দিয়ে বানানো হয় আকাশের ঢালু পথ। তাঁর পাঁজর দিয়ে মোরদখ তৈরি করেন স্বর্গ ও মর্ত্যের সিন্দুক। তাঁর অশ্রুময় আঁখি দুটি থেকে উৎপন্ন হয় দজলা ও ফোরাত, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস। তাঁর পুচ্ছ থেকে সৃজিত হয় আকাশগঙ্গা। তাঁর স্তন থেকে বানানো হয় পর্বত। এভাবে জগৎ সৃষ্টি করে মোরদখ ব্যাবিলনকে বেছে নেন তার আবাসস্থল হিসেবে। কিংগুকে ধরে আনা হয়, বাকি দানবদেরও। কিংগুকে হত্যা করা হয়, তার লাল রক্ত মেশানো হয় পৃথিবীর রক্তমৃত্তিকার সাথে। তা দিয়ে বানানো হয় মানবদের, যারা আইগিগি দেবতাদের সেবক হিসেবে কাজ করবে। দেবতারা উপঢৌকন আর পঞ্চাশটি প্রদত্ত নামে গর্বিত ও মহান করে তুলেন মোরদখকে।

প্রতি বছর ব্যাবিলনের নববর্ষ বা আতিকু উৎসবে এই জয়পরাজয়ের কাহিনি উদযাপিত হতো। জীবন সেখানে প্রাগৈতিহাসিক প্রকৃতির ওপর বিজয়ের কলরোল, অন্তহীন এক অভিযাত্রা। বীরকেন্দ্রিক চেতনার

জয় হলো, প্রকৃতি তথা সৃজনকারী উৎসজননীর পরাজয় হলো, বসত হলো নতুন দলের, নারী পরাভূত হলো। এভাবেই কিংবদন্তির রূপক ও রহস্যের আড়ালে চোরাসত্য বয়ে চলল। আর এভাবেই, মাতৃতান্ত্রিক প্রাচীন সভ্যতা হার মানে নৃশংসভাবে পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক নতুন সভ্যতার কাছে। জন্ম হয় নতুন দেবতাদের, নতুন সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়মের, নতুন ধারণার।

রবার্ট গ্রেভস এই কথাটাই বলেছেন। তিনি আদিম অতীতে, যার সূত্র, ইতিহাস, ধারণা এখন লুপ্ত, মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতায় রূপ পরিবর্তন হিসেবেই দেখেছেন এটা। পরবর্তীকালে মারিয়া গিম্বুতাস, মেরলিন স্টোন এবং আরো অনেকেই এটাকে রূপ দিয়েছেন মহাদেবী তত্ত্বে। এই তত্ত্ব বলে যে তিয়ামত এবং অন্য দানবীয় চরিত্রগুলো শান্তিপ্রিয়, নারীকেন্দ্রিক ধর্মের পূর্বতন প্রধান দেবীই থাকে যারা সহিংস হয়ে উঠলে পরে বদলে যায় দানবীতে। পুরুষ বীরের হাতে তাদের পরাজয় প্রকাশ করে পুরুষশাসিত ধর্মগুলো কীভাবে আদিম সমাজ দিয়েছে বদলে। কীভাবে পরাভূত করেছে তাদের। অবশ্য, আরো পরে লোটে মোটজ, সিনথিয়া এলার এবং অন্যেরা খণ্ডন করেন এই মত।

রহস্যময়ী, শিশুহন্তারক, পুরুষপ্রলুব্ধক, শয়তানসঙ্গিনী এক নারী চরিত্রের বিচ্ছিন্ন উল্লেখ মেলে প্রাচীন সুমের, আক্কাদীয়, আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় বর্ণনায়। কিছু ইহুদি শাস্ত্রে, কাব্বালায়, ইহুদি লোকসাহিত্যে, এবং মধ্যযুগীয় মধ্যপ্রাচ্যিক কথা ও গাথায়। আমরা তাকে চিনি লিলিথ নামে।

হিব্রু লায়িল আর আরবি লায়ল, দুটোরই মানে রাত। লিলিথের তালমুদীয় আর ইদ্দিশ ব্যবহার হিব্রুর সাথে মেলে। বাইবেলে লিলিথ এসেছে একটিবারই, বুক অব ইশাইয়াহ ৩৪:১৪-তে, যেখানটায় আটটা অপরিচ্ছন্ন প্রাণীর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এর। যাদের কারোর কারোর সাথে সম্পৃক্ততা আছে শয়তানের। বাইবেলের কিং জেমস সংস্করণে (১৬১১) অবশ্য এটাকে পেঁচা হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। তবে, স্বর্গীয় সম্পর্ক লিলিথের সাথে প্রথম মেলে আলফা বিটা ডিবেন সিরা বা আলফাবেট অব বেন সিরা-য় (৮ম-১০ম শতাব্দী)। লিলিথের উল্লেখ মেলে ডেড সি স্ক্রোলে, কামরান গোত্রের কাছে যা পাওয়া। কামরানেরা শয়তানতত্ত্বে ছিল বিজ্ঞ, আর প্রাজ্ঞসঙ্গীত বা সং অব দ্য সেজ-এ আসে লিলিথের নাম, ভূততাড়ানিয়া মন্তরের সময়। আসে তালমুদের (৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী) গেমারার তিনটি শ্লোকে, লিলিথের পরিচয় বা সাবধানবাণী হিসেবে। কোথাও বলা আছে, লিলিথের মতো মেয়েটির চুল দীঘল বা লিলিথের আছে ডানা। কোথাও বলা হচ্ছে, কোনো পুরুষ যেন কোনো ঘরে রাতে একাকী না-ঘুমায়, তাহলে সে লিলিথের খপ্পরে পড়তে পারে। কাব্বালাতেও তার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেখানে কোথাও সে আদমের সঙ্গিনী, কোথাও সে দেবদূত সামায়েলের, কোথাও তার জন্ম আদমের সাথে একই দেহে। পরে ঈশ্বর, সম্ভবত সর্বপ্রথম শল্যচিকিৎসা করে, আলাদা করেন তাদের। কোথাও সে আদিতম আলো থেকে উদ্ভূত, মানে, তার গুপ্ত কোনো অংশ থেকে। ইহুদিদের জোহর নামের আরেকটি শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে এমনিভাবে, 'সে নিশাচারিণী, বিভ্রান্ত করে পুরুষদের আর ঘটায় তাদের সুপ্তিস্খলন।' সেখানে এও বলা আছে যে, অনুতপ্ত আদম যখন ইভ থেকে ১৩০ বৎসরের জন্যে বিচ্ছিন্ন থেকেছিল, তখন লিলিথ এবং নামাহ তাকে প্রলুব্ধ করে তার কাছ থেকে শত সন্তান সংগ্রহ করে, যারা মূলত পিশাচ, প্রেত, দানব ও 'মানবজাতির কলঙ্ক। সিগমুন্ড হরউইটজের মতে, লিলিথ গ্রিক লামিয়া-র সাথে সংশ্লিষ্ট, যারা শিশু অপহারক এক দানবী গোত্র। আরেকখানে বলা আছে, সে হেকেটির কন্যা, জিউসপত্নী হেরা যৌন ঈর্ষাবশত তার সন্তানদের (একটি বাদে) অপহরণ ও হত্যা করায় সেও উন্মত্ত হয়ে প্রতিশোধবাসনায় শিশুদের মায়ের

কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে। তার অদম্য যৌনবাসনা যেমন তুঙ্গস্পর্শী, তেমনই সে শিশুখাদক। রক্তচোষাও সে, পুরুষদের রক্তপান তার কাম্য।

এমনি করে, খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর আগের ব্যাবিলন থেকে মধ্যযুগ অবধি লিলিথ বিভিন্ন নামে ও পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে এসেছে সম্ভবপর নেতিবাচক যত বৈশিষ্ট্যে। সে পুরুষদের স্বপ্নদোষ ঘটায়, স্বপ্নে বা ঘুমে সঙ্গত হয় পুরুষের সাথে, আর জন্ম দেয় দানবদের। সে শিশুদের হত্যা করে শ্বাসরোধ করে, সে প্রলুব্ধ করে পুরুষদের, সে স্বর্গীয় অভিশাপ, হয়তো ব্যাবিলনের বেশ্যাও সে-ই।

'লিলিথের করাল প্রভাব শুধু শিশুদের ওপরেই পড়ে না। সে আরো ভয়াবহ পুরুষদের জন্যে, বিশেষত তরুণদের জন্যে। লিলিথ পুরুষসম্মোহনকারিণী। লিলিথ হচ্ছে রূপসী ব্যাভিচারিণী, অবিবাহিতা বেশ্যার সেমিটীয় নাম, যে হাটেমাঠেঘাটে পুরুষদের সম্ভোগ করে।' বলেছেন রুডলফ (দ্যা রোম্যান্টিক এগোনি ১৯৩৩ : মারিও প্রাৎজ)।

কিন্তু, তার ও আদমের সম্পর্ক, যেটা আলফাবেট অব বেন সিরা-য় পাওয়া যায়, সেটা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনিই অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণের দাবিদার। বেন সিরা অনেকের কাছে ব্যাঙ্গাত্মক রচনা, কারোর কারোর কাছে মিশনাহ বা বাইবেলের আদিপুস্তকের বিশদ ব্যাখ্যা। কিন্তু লিলিথের এই বিবরণীটিই এমনকি পণ্ডিত বা তাত্ত্বিকদের বিশাল অংশের কাছেও গৃহীত এবং আধুনিক মননেও। বেন সিরা-য় ২২টি পরিচ্ছেদ, ২২টি হিব্রু বর্ণমালা অনুযায়ী। এর ৫ম পরিচ্ছেদে আছে লিলিথের কথা, যে ধ্বংসাত্মক, উড়তে পারে, আর যৌনক্ষুধাকাতর। বেন সিরা নামের একটি চরিত্র ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাদনেজারের পুত্রসন্তানকে শয়তানের আছরমুক্ত করে, যে রাজার পারিষদও বটে। বাইবেলের উল্লেখ করে (জেনেসিস ২:১৮) সে জানায়, ঈশ্বর উপলব্ধি করলেন যে পুরুষের পক্ষে একা থাকা কাঙ্ক্ষণীয় নয়। আদম তখন যত্রতত্র পশুসঙ্গম করে বেড়াত এবং সে নিজের মতো যুৎসই সঙ্গীর জন্যে ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ জানায়। মাটি থেকেই তিনি লিলিথকে বানান এবং উপহার দেন আদমকে।

এবং, সেই থেকে শুরু ব্যাটল অব দ্য সেক্স বা নারীসাম্যের লড়াইয়ের।

সঙ্গমের সময় মিশনারি পজিশন বা নারীর নিচে-থাকার যে বহুলপ্রচলিত নিয়ম, লিলিথ তা মানতে অসম্মতি জানায়। আদম শুধু তাকে সঙ্গমের কাজেই ব্যবহার করতে চায়, তা নয়। সে চায়, গৃহকর্মও লিলিথই সম্পাদনা করবে। লিলিথ জানায় প্রবল প্রতিবাদ। সে বলে, 'তোমার নিচে কেন শোব আমি? আমাদের দুজনকেই মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছে, কাজেই দুজনেই আমরা সমান।' আদম জোর করতে চায়, যেটি ম্যারিটাল রেইপের প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু লিলিথ ঈশ্বরের গুপ্ত নাম, টেট্রাগ্র্যামাটন, 'যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে সব কিছুই', উচ্চারণ করে আর মিলিয়ে যায় হাওয়া হয়ে; এবং, এই গুপ্ত নাম উচ্চারণের কারণে সে স্বর্গরাজ্যে অভিশপ্ত হয়। আদম ঈশ্বরের কাছে এই তথ্য জানালে তিনি তিনজন দেবদূত পাঠান তাকে খুঁজতে। সেনয়, সানসেনয় ও সেমানগেলফ। তারা লিলিথকে খুঁজে পায় লোহিত সাগরের উপকূলে। সেখানটায় সে দানবপ্রেতবেষ্টিত, সঙ্গম করছে তাদের সাথে নির্বিচারে, জন্ম দিচ্ছে প্রতিদিন শত সন্তান। 'ফিরে যাও আদমের কাছে, নইলে ডুবিয়ে মারব তোমায়', শাসায় দেবদূতেরা। 'লোহিত সাগরের তীরে আসার পর কীভাবে সৎ স্ত্রীর মতো ফিরে যাব আমি আদমের কাছে?' 'প্রত্যাখ্যানের অর্থ হবে মৃত্যু,' তারা ভয় দেখায়। প্রতিবাদ জানায় লিলিথ। 'কীভাবে হবে মৃত্যু যখন খোদ ঈশ্বরই আমায় হুকুম দিয়েছেন সব নবজাতকের ওপর অধিকার বিস্তারের, পুরুষ শিশুদের ওপর আটদিনতক, যতদিন তাদের লিঙ্গাগ্রচ্ছেদ না-হয়, আর নারী

শিশুদের জন্যে কুড়িদিন অবধি? তবে তোমাদের তিনজনের নামাঙ্কিত কবচ নবজাতকদের কাছে থাকলে তাদের ছেড়ে দেব আমি, প্রতিজ্ঞা করছি।' কিন্তু অবাধ্য লিলিথের প্রতি ঈশ্বরের রোষ শমিত হয় নি তারপরেও। প্রতিদিন তাঁর অভিশাপে মৃত্যু ঘটেছে তার শত দানবসন্তানের, লিলিম যাদের নাম। কিন্তু, ফিরে আর যায় নি লিলিথ; এবং সে অমর, কারণ স্বর্গরাজ্য থেকে আদম ও ইভের পতনের আগেই সে বিদায় নেয়।

দীঘল চুল, পক্ষবিশিষ্ট, শিশুহন্তারক, যৌনতাকাতর, প্রলুব্ধকারিণী হিসেবে আদ্যিকাল থেকে পরিচিত লিলিথের এই আদিরূপ সত্যিই বিস্ময়াবহ। সে প্রথম নারীসাম্যবাদী প্রতিবাদী, প্রথম নারী স্বাধীনতার পতাকাবাহী, প্রথম নারীবাদের ইশতেহারঘোষক, প্রথম আত্মসম্মানবোধদীপ্তা তেজস্বিনী, প্রথম নারী লড়াকু পুরুষতন্ত্রের, এমনকি সর্বশক্তিমানের বিপক্ষেও। এমনকি নিজের সন্তানহননের শঙ্কাও তাকে নিজস্বতার দাবি থেকে টলাতে পারে নি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের শাস্ত্রকার, ধর্মবেত্তা, পুরোহিততন্ত্র, সাধারণ ও অসাধারণ জনতা লিলিথকে যতই ঘৃণ্য, পিশাচী, প্রলুব্ধকারিণী হিসেবে চিহ্নিত করুক, আধুনিক যুগ তাকে বরেণ্য সম্মান দিয়েছে অনেকটাই, শিল্পে-সাহিত্যে-জনচিত্তে তাকে পরিচিত করে। পুরুষতন্ত্রের নিয়ত চরিত্র ও দণ্ড, অবাধ্য নারীদের কলঙ্কিতকরণ, তার ললাটলিখন হলেও, তার বিদ্রোহী চরিত্র আজো নন্দিত, অনুসরণীয়, স্পৃহনীয়।

হিল্লোল দত্ত ব্যাঙ্কার, অনুবাদক। hillolsctg@yahoo.com